ঊনবিংশ শতকে নারীমুক্তি ও স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে বিদ্যাসাগরের অবদান

সারসংক্ষেপ

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষ ছিল এক ঐতিহ্যবাহী দেশ। এই দেশে প্রাচীনকাল থেকেই নারী জাতিকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখা হত। মা, বোন ও অর্ধাঙ্গিনী সব রূপেই নারীজাতিকে সমানভাবে গুরুত্ব দেওয়া হতো। মেয়েদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেও কোন ত্রুটি ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে সমাজের অগ্রগতির সাথে সাথে মেয়েদের গুরুত্বও হ্রাস পেতে থাকে, এমনকি মেয়েদের নিজস্ব স্বাধীনতাও হারিয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে ঊনবিংশ শতকে নারীজাতির উন্নয়ন ও স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে যেসকল মনীষী নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন তাদের মধ্যে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন অন্যতম। কুসংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদী বিদ্যাসাগর হিন্দুসমাজে প্রচলিত বিভিন্ন কুপ্রথার বিরুদ্ধে কেবলমাত্র সোচ্চার হয়েছিলেন তাই নয়, এই কুপ্রথাগুলি দূর করে নারীজাতির মুক্তি ও নারীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারও ঘটিয়েছিলেন। তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে হিন্দুসমাজে বিধবা বিবাহ আইন পাস হয়েছিল। এই আইন শুধু পাস করাই নয়, নিজ অর্থ ও উদ্যোগে তিনি বহু বিধবাদের পুনরায় বিবাহ দিয়ে সমাজে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। আলোচ্য প্রবন্ধে রয়েছে ঊনবিংশ শতকে নারীমুক্তি ও স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদানের আলোচনা।

সূচক শব্দ: বিধবা বিবাহ, বাল্যবিবাহ, বহুববিবাহ, নারীশিক্ষা, স্বাধীনতা।

লেখক

পিংকি ভৌমিক
সহকারী শিক্ষিকা, ইতিহাস বিভাগ,
নিউ ইন্টিগ্রেটেড গভর্নমেন্ট স্কুল, হবিবপুর, মালদা,
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
pinkybhowmik9@gmail.com

e-ISBN: 978-93-7020-770-7

মূল প্রবন্ধ

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাসে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এক অনন্য চরিত্র। সে সময়কালে সমাজে বহু বিখ্যাত মহাপুরুষের আর্বিভাব ঘটেছিল যারা হিন্দু সমাজে প্রচলিত বহু কুসংস্কারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। বিদ্যাসাগরের পূর্বে রাজা রামমোহন রায় ও হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও হিন্দুসমাজ সংস্কারের কাজে এগিয়ে এসেছিলেন। রাজা রামমোহন রায় হিন্দু সমাজে দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত জঘন্য কুপ্রথা সতীদাহের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। তাঁর সক্রিয় প্রচেষ্টার ফলে গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ১৮২৮ সালে আইন প্রনয়নের দ্বারা সতীদাহ প্রথা সমাজ থেকে চিরতরে নিষিদ্ধ করেন। ডিরোজিও ও তাঁর অনুগামী শিষ্যরা ইয়ং বেঙ্গল নামে সমাজে পরিচিত ছিল, তাঁরাও সর্বান্তকরণে সমাজে দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত বিভিন্ন অনাচার, কুসংস্কার দূরীকরণের চেষ্টা করেছিলেন। এই মহাযজ্ঞের আগুনেই বিদ্যাসাগর ঘৃতাহুতি দিয়েছিলেন।

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাধাকান্ত দেব, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারকদের উদ্ভব ঘটেছিল। তাঁরা সতীদাহ প্রথা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন প্রভৃতি কুসংস্কারগুলির বিরুদ্ধে ও স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের পক্ষে সরব হয়েছিলেন। কিন্তু সেসময় নারীদের প্রকৃত স্বাধীনতা প্রদান ও স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে অন্যতম অন্তরায় ছিল বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও বিধবা বিবাহ। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজ উদ্যোগে সমাজে এসকল কুপ্রথাগুলি দূরীকরণের কাজে এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁর বিধবা বিবাহ প্রচলন এবং বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ চিরতরে সমাজ থেকে দূরীভূত করার প্রচেষ্টায় সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলন আসলে দয়ারসাগর বিদ্যাসাগরের চারিত্রিক ঋজুতার পরিচায়ক ছিল। আসলে তাঁর চরিত্রের একটি বড় গুণ হল তিনি যা বিশ্বাস বা প্রচার করতেন, তা তিনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেও প্রয়োগ করতেন বা প্রয়োগের চেষ্টা করতেন। বিদ্যাসাগর সাধারণভাবে নারী মুক্তি বলতে নারী স্বাধীনতার কথা বলেছিলেন। নারী স্বাধীনতা বলতে বিদ্যাসাগর মনে করতেন সমাজের প্রচলিত খারাপ ভালো সম্পর্কে নারীদের বিবেচনা করার স্বাধীনতা ও নারীদের যথাযথভাবে শিক্ষা প্রদান করে সমাজে প্রাচীনকাল থেকে চলতে থাকা লিঙ্গ বৈষম্য দূর করা। তাঁর এই সদর্থক প্রচেষ্টা হঠাৎ করে শুরু হয়নি। দীর্ঘদিন তিনি হিন্দুসমাজের অভ্যন্তরীণ কুসংস্কার গুলিকে পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে বুঝতে পেরেছিলেন যে, মেয়েদের সমাজে যথাযথ স্বীকৃতি প্রদানের দ্বারাই এক আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে। নারীকে শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে তাঁর ধারনা ছিল নারী পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা। তবে একথা সত্য যে, সমাজে নারী পুরুষের সামাজিক অবস্থানগত পার্থক্য একটি স্বাভাবিক বিষয়। যুগের থেকেও অন্তত একশো বছর এগিয়ে থাকা এই সমানাধিকারের শিক্ষাই বিদ্যাসাগরের মতে প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষা- যা তিনি শেখাবার চেষ্টা করেছিলেন, বিশেষ ভাবে তাঁর কালের পুরুষদের। বিদ্যাসাগরের সামাজিক সংস্কারগুলির পুরোভাগে ছিল বিধবা বিবাহের প্রচলন, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ রোধ ও স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার ঘটানো। আলোচ্য লেখায় রয়েছে কালানুক্রমিক ভাবে দয়ারসাগর বিদ্যাসাগরের সামাজিক সংস্কারগুলি সম্পর্কে আলোচনা।

বিধবা বিবাহের প্রবর্তনে বিদ্যাসাগরের অবদান

বিধবা বিবাহের প্রবর্তন বা অনুরূপভাবে বলা যায় বিধবা বিবাহের পুনঃপ্রবর্তন করা ছিল বিদ্যাসাগরের জীবনের সবথেকে মহান কর্ম। বিদ্যাসাগর মনে করতেন-"বিধবাবিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম। ... এ বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙমুখ নাই।"[১]. বিদ্যাসাগর মহাশয় কেন বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের কাজে এগিয়ে এসেছিলেন এ বিষয়ে তাঁর

জীবনীকারগণ মূলত দুটি কারণের কথা বলেছিলেন, প্রথমত, বিদ্যাসাগরের ছোট বেলায় তাঁর প্রিয় সহচরীর জীবনযন্ত্রণা তাঁকে বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের উদ্দীপিত করেছিল। তাঁর ছোটবেলায় প্রিয় বান্ধবী যিনি প্রায় তাঁর সাথে খেলাধুলা করতেন, বিদ্যাসাগর কলকাতায় পড়াশুনার জন্যে চলে গেলে বহুদিন পর বীরসিংহ গ্রামে ফিরে এসে জানতে পারেন তাঁর প্রিয় সহচরীর বিবাহ সম্পূর্ণ হয়েছে। এই ঘটনার সামান্য কিছুদিন পর জানতে পারলেন যে মেয়েটির স্বামী মারা গেছে এবং এর ফলে অশেষ দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে তাঁর বৈধব্য জীবন যাপিত হচ্ছে। এই ঘটনায় বিদ্যাসাগর গভীরভাবে মর্মাহত হন এবং তখন থেকেই মনে মনে বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের সংকল্প করেন। এছাড়াও দ্বিতীয় কারন হিসাবে বলা যায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মাতা ভগবতী দেবী এক বিধবার কষ্টের কথা বিদ্যাসাগরকে শুনিয়ে বলেছিলেন যে, "তুই এতদিন যে শাস্ত্র পড়লি তাহাতে বিধবাদের কি কোনো উপায় নেই?"[২] -বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁকে হিন্দুসমাজের উন্নতিকল্পে বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের কথা বলেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে দু-একটি ঘটনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েই যে তিনি বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের কাজে এগিয়ে এসেছিলেন তা নয়। তিনি ছেলেবেলা থেকেই বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও কৌলিন্য প্রথা দেখে এসেছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন যে, অল্প বয়েসে বিধবা হয়ে হিন্দু নারীদের চরম কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যে দিয়ে কীভাবে জীবন যাপন করতে হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলতেন, 'হে ধর্ম তোমার মর্ম বুঝা ভার। কিসে তোমার রক্ষা হয়, আর কিসে তোমার লোভ হয়, তা তুমি জান'। তিনি মনেপ্রাণে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, যে দেশের পুরুষ জাতির দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদাসদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর্ম ও পরম ধর্ম, আর যেন সেদেশে হতভাগা নারীজাতি জন্মগ্রহণ না করে। তিনি তাঁর জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে অনুভব করেছিলেন নারীব্যতীত সমাজের প্রকৃত কল্যাণসাধন অসম্ভব, এই মানবিক চেতনা দয়ারসাগর বিদ্যাসাগরের মধ্যে প্রবলভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এজন্য তিনি বিধবা বিবাহ প্রবর্তনকে তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সৎকর্ম বলে মনে করতেন। এই মহান কার্য সম্পাদন করতে গিয়ে তিনি সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন, এমনকি এই ত্যাগ করতে তিনি প্রস্তুতও ছিলেন। বিধবা বিবাহকে সমাজে পুনঃপ্রবর্তনের জন্য বিদ্যাসাগর রামমোহনের পথে এগিয়েছিলেন, তিনি প্রথমে শাস্ত্রের ব্যাখ্যার মাধ্যেমেই বিধবা বিবাহকে আইনসিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। তিনি বিধবা বিবাহ নৈতিক, সামাজিক এবং মানবিক কারণে প্রচলিত হওয়া উচিত বলে মনে করতেন; তবুও তাঁর রচিত, 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব', (১৮৬৫) পুস্তকের দুটি খন্ডেই তিনি বিধবা বিবাহকে শাস্ত্রসম্মত বলে প্রমাণ করেছেন। তাঁর কারন তিনি অনুভব করেছিলেন নৈতিক, সামাজিক কারণকে ভিত্তি করে বিধবা বিবাহ পুনঃপ্রবর্তনের চেয়ে শাস্ত্রীয় আলোচনার দ্বারা বিধবা বিবাহ পুনঃপ্রবর্তনকেই সমাজ অধিক পরিমান মান্যতা দিবে। বিধবা বিবাহের সমর্থনে পরাশর সংহিতায় তিনি খুঁজে পেলেন, "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ। / পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে।।"[৩]- অর্থাৎ স্বামী অনুদ্দেশ হলে, মৃত্যু হলে, ক্লীব স্থির হলে, সংসার- পতিত হলে, স্ত্রীর পুনর্বার বিবাহ করা শাস্ত্রবিহিত। বিদ্যাসাগর তাঁর প্রস্তাবে নৈতিক ও সামাজিক যুক্তিগুলিকে তুলে ধরে, তিনি দেশবাসীর শাস্ত্রবোধের প্রতি নয়, মানবিকবোধের প্রতি আবেগপ্রবন আবেদন জানিয়েছিলেন। তাঁর কথায়, "যদি যুক্তি মাত্র অবলম্বন করিয়া ইহাকে (বিধবাবিবাহকে) কর্তব্যকর্ম বলিয়া প্রতিপন্ন কর তাহা হইলে এতদ্দেশীয় লোকে কখনই ইহা কর্তব্যকর্ম বলিয়া স্বীকার করিবেন না। যদি শাস্ত্রে কর্তব্যকর্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করা থাকে, তবেই তাহারা কর্তব্যকর্ম বলিয়া স্বীকার করিতেও তদনুসারে চলিতে পারেন। এইরূপ বিষয়ে এদেশে শাস্ত্রই সর্বপ্রধান প্রমান এবং শাস্ত্রসম্মত কর্মই সর্বতোভাবে কর্তব্যকর্ম বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে।"[৪]- অর্থাৎ তিনি বিধবাবিবাহ প্রবর্তনে সমস্ত যুক্তি-তর্কের উপরে শাস্ত্রীয় নিধানকে রেখেছিলেন, তবুও শাস্ত্রীয় বিধানকে তিনি পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপেক্ষিতে গ্রহণ করেছিলেন। একজন নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক যেমন তাঁর যুগের যেকোনো ঘটনার প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন না করে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ইতিহাস লেখেন বিদ্যাসাগরও তেমনি সত্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা রেখে শাস্ত্রীয় বিধানকে গ্রহন করেছিলেন।

e-ISBN: 978-93-7020-770-7

বিধবা বিবাহের সমর্থনে তিনি ১৮৫৫ সালে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করলেন। এক সপ্তাহের মধ্যেই এই পুস্তকের দু'হাজার কপি বিক্রি হয়ে গেল, ফলে সমগ্র দেশে তোলপাড় শুরু হয়ে গেল। এরপর সংস্কৃত ও ইংরেজীতে অনূদিত হয়ে সারা ভারতে বইটি ছড়িয়ে পড়ল। এই ঘটনায় সংরক্ষনশীলেরা যেমন ক্ষোভে ফেটে পড়লেন তেমন প্রগতিশীলেরা বিদ্যাসাগরের এই নতুন উদ্যোগকে সমর্থন জানালেন। এই ঘটনার পর ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে বহু মানুষের স্বাক্ষর সম্বলিত বেশ কিছু আবেদনপত্র ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরিত হয়েছিল। সেগুলির মধ্যে মেদিনীপুর থেকে রাজনারায়ণ বসু প্রেরিত আবেদনপত্র, আহমেদাবাদ থেকে ৫৪ জনে স্বাক্ষরিত আবেদনপত্র চট্টগ্রামের বিশিষ্ট হিন্দুদের প্রেরিত আবেদনপত্র, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের আবেদনপত্র প্রভৃতি বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মজার কথা হল বিধবা বিবাহ প্রচলনের বিপক্ষে মতপ্রকাশ করেও বহু আবেদনপত্র প্রেরিত হয়েছিল ব্যবস্থাপক সভায়। কিন্তু শেষপর্যন্ত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং বহু যুক্তি-তর্কের ফলস্বরূপ ১৮৫৬ সালের ২৬শে জুলাই বিধবাবিবাহ আইন বা Act XV of 1856 dated 26th July being an act to remove the legal obstacles to the marriage of Hindu Widoues পাস হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সক্রিয় প্রচেষ্টার ফলে হিন্দুসমাজে বহু চর্চিত বিধবা বিবাহ আইন পাস হতেই তিনি দ্বিগুন উৎসাহ নিয়ে বিধবাবিবাহ বাস্তবায়নের কাজে সচেষ্ট হয়েছিলেন। বহু প্রচেষ্টার পর বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত উদ্যাগে ১৮৫৫ সালের ৭ই ডিসেম্বরের আধুনিক ভারতের প্রথম বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল, পাত্র ছিল সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও বিধবা পাত্রীর নাম ছিল কালীমতী দেবী। এর পরেও তাঁর উদ্যোগে বহু বিধবা বিবাহ সম্পাদিত হয়েছিল, এমনকি নিজ পুত্র নারায়ণ চন্দ্রের বিবাহ তিনি বিধবা পাত্রীর সঙ্গে দিয়েছিলেন। এই সৎকার্য সম্পাদনের জন্য তিনি বহু ঋণও করেছিলেন। সর্বস্বান্ত হয়েও বিধবা বিবাহ সম্পাদনের এই সৎ প্রচেষ্টা থেকে কখনও বিরত থাকেননি। শেষজীবনে বিদ্যাসাগর মহাশয় উপলব্ধি করেছিলেন যে বিধবা বিবাহকে শাস্ত্রীয় বিবাহরূপে স্বীকৃতি দিলেই তা সর্বজনমান্য হবে। অনেকে টাকার লোভে বিধবা বিবাহ করে তারপরই ঐ বিবাহকে অস্বীকার করেছে এবং স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেছে এমন ঘটনাও তাঁর সাথে ঘটেছিল। সেই জন্য পরবর্তীকালে বিধবা বিবাহের প্রস্তাব এলে তিনি যাচাই না করে তা গ্রহণ করতেন না। এই যাচাই করার সময়ে বিধবা কন্যা বিদ্যাসাগরের বাড়িতে অবস্থান করত। তাই বলা যায় বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অবদান ছিল অনস্বীকার্য।

বাল্যবিবাহ রোধে বিদ্যাসাগরের অবদান

হিন্দুসমাজের আরও একটি নিকৃষ্ট কুপ্রথা বাল্যবিবাহ রোধেও বিদ্যাসাগর মহাশয় সচেষ্ট হয়েছিলেন। বাল্যবিবাহ প্রথা ছিল তৎকালীন সমাজের এক জ্বলন্ত অভিশাপ। ১৮৫০ সালে আগস্ট মাসে 'সর্বশুভকরী' পত্রিকায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমাজ সংস্কার বিষয়ক প্রথম প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। সেই প্রত্রিকাটির শিরোনাম ছিল 'বাল্যবিবাহের দোষ'। এই ‘বাল্যবিবাহের দোষ’ শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি বাল্যবিবাহ প্রথা রোধে সমাজের সক্রিয় ভূমিকার কথা আলোচনা করেছিলেন। তিনি বলেন, “বাল্যকালে বিবাহ হওয়াতে বিবাহের সমধুর ফল যে পরস্পর প্রণয়, তা দম্পতিরা কখনই আস্বাদ করিতে পারে না...। বাল্যবিবাহে বালিকাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হয় এবং শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে দুর্বলতা প্রকাশ পায়। বাল্যবিবাহ জাত সন্তান-সন্ততিগন স্বাস্থ্যের দিক থেকে দুর্বল হয়; তারা অধিক কাল বাঁচিতে পারেনা। অনেক সময় মায়ের গর্ভে বা প্রসবের সময় বাচ্চা মারা যায়।”[৫]- বিদ্যাসাগর মহাশয় মনে করতেন বাল্যকালে বিবাহের ফলে বহু নারীকে অসময়ে জীবন দিতে হয়েছে, নারীজাতি শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তাছাড়াও বাল্যবিবাহের সবথেকে বড় কুফল ছিল সমগ্র জীবন বৈধব্য ভোগ করা। “বোম্বাইয় প্রদেশের পার্সি সংস্কারক বেহরামজী মেরোয়ানজী মালাবারীর 'Infant Marriage and Enforeed Widowhood' নামক পুস্তিকাতে

e-ISBN: 978-93-7020-770-7

বিবাহ বিবাহ বিষয়ে কয়েকটি প্রস্তাব ছিল। যেমন- (১) বিবাহিত বালকদের ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা দিতে দেওয়া হবে না, (২) সরকার অবিবাহিত প্রার্থীদের চাকরিতে অগ্রাধিকার দেবে, (৩)সামাজিক সংস্কারের জন্য একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন সংস্থা গঠন করা হবে। এই প্রস্তাবগুলি নিয়ে কংগ্রেস সহ বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে অনেক আলোচনা হয়েছিল। সরকার এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে রাজি হয়নি।"[৬]- ১৮৬০ সালে 'সহবাস সম্মতি আইন' পাসের মাধ্যেমে মেয়েদের বিবাহের বয়স দশ বছর স্থির করা হলে বিদ্যাসাগর মহাশয় তীব্রভাষায় এই আইনের বিরোধিতা করেন। পরবর্তী কালে ১০ বছরের পরিবর্তে মেয়েদের বিবাহের বয়স ১২ বছর স্থির করা হলেও বিদ্যাসাগর এই আইনটিকে নাকচ করেছিলেন, এবং শাস্ত্রীয় বিধানকেই এক্ষেত্রে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তাঁর মতে, "যে বিধি স্ত্রী দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করলেই তাহার প্রতি নৃশংস আচরনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিতে উদ্যত, সে বিধির সমর্থন আমি কোনো প্রকারেই করিতে প্রস্তুত নই।"[৭]-বিদ্যাসাগর মহাশয় গর্ভাধান সংস্কারের ওপর গুরুত্ব দিয়ে শাস্ত্রানুসারে গর্ভাধান সংস্কার অপরিহার্য বলে উল্লেখ করেছেন। প্রধানত এই কারণের সহবাস সম্মতির বয়স তিনি অনির্ধারিত রাখতে চান, কারণ রজোদর্শনের বয়েসের পার্থক্য ঘটে। তাই তিনি লিখেছেন "The protection which the Bill proposes to give to child wives is very small. In the majority of cases the first occurrence of menses is from 12 to 15."[৮]- সুতরাং তিনি সহবাস সম্মতির বয়সকে অনির্দিষ্ট রেখে শরিয়তী আইনের মতে রজোদর্শনের পর সহবাসকেই আইন সিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। আসলে প্রচলিত প্রথা অনুসারে সেই সময় বিয়ের পর মেয়েরা রজঃস্বলা হলে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনের পর স্বামী স্ত্রীকে সহবাসের সম্মতি দেওয়া হত। তাই তিনি সহবাস সম্মতির ক্ষেত্রে আইনের ওপর জোর না দিয়ে মেয়েদের রজঃস্বলা হওয়ার ব্যাপারটির ওপর অধিক পরিমাণে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর যুক্তি ছিল বিজ্ঞানসম্মত ও মানবিক। শুধু তাই নয় বিধবা বিবাহের ক্ষেত্রে যেমন তিনি নিজের পুত্রের সঙ্গে বিধবা কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন, ঠিক একইভাবে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য নিজের কন্যাদেরও বিবাহ তিনি ষোল বছরের পর দিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে স্ত্রী জাতির প্রতি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের করুণা, সম্মান ও মমতাবোধ ছিল অকল্পনীয়। কোনও আবেগের দ্বারা তাড়িত হয়ে তিনি নারী কল্যাণের কাজে এগিয়ে আসেননি, তাঁর অন্তরের সাড়া থেকেই তিনি নারী মুক্তির এই কঠিন যজ্ঞের অগ্রসর হয়েছিলেন। বাল্যবিবাহ রোধ তাঁর এই আন্দোলন বহুল পরিমাণে সমাজে সাড়া না ফেললেও বাল্যবিবাহ রোধে তাঁর প্রচেষ্টা ছিল নিখাদ। প্রকৃতপক্ষে যুগের থেকে অগ্রণী হয়ে তিনি এই কুপ্রথা সমাজ থেকে দূরীকরণের চেষ্টা করে ছিলেন।

বহুবিবাহ রোধে বিদ্যাসাগরের অবদান

বাল্যবিবাহের মতো হিন্দু সমাজের আর এক কুপ্রথা ছিন বহুবিবাহ প্রথা। বিধবা বিবাহ প্রবর্তন এবং বাল্যবিবাহের মতো বহুবিবাহ প্রথা রদেও বিদ্যাসাগর মহাশয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তৎকালীন সময়ে বহুবিবাহ প্রথা রদের জন্য বিভিন্ন পত্রপত্রিকা বিশেষ করে 'বিদ্যাদর্শন' ও 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকা জনগণের মধ্যে বহুবিবাহের অযৌক্তিকতা তুলে ধরতেও সচেষ্ট হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের বহু পূর্বে কিশোরীচাঁদ মিত্র ও অক্ষয়কুমার দত্তের 'সমাজোন্নতি বিধায়িনী সভার' পক্ষ থেকেও ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বহুবিবাহ প্রথা নিবারণের জন্য আবেদন করা হয়েছিল। একদিকে সেসময় হিন্দু সমাজের কিছু কিছু প্রগতিশীল মানুষজন যেমন বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ প্রথা রোধের জন্য সমর্থন জানিয়েছিলেন, অন্যদিকে সেই সংখ্যক মানুষের থেকেও আরও বেশীসংখ্যক মানুষজন বহুবিবাহ প্রথা রদের বিরুদ্ধেও সোচ্চার হয়েছিলেন। সেইসমস্ত রক্ষণশীল মানুষদের অভিপ্রায় ছিল যেকোনো প্রকারেই হোক কৌলিন্যপ্রথাজাত বহুবিবাহ সমাজে টিকিয়ে রাখা। তাঁরা মনে করতেন সেই সকল কুপ্রথা পালন করার মধ্যে দিয়ে মৃত্যুর পর তারা স্বর্গ লাভ করবে, তাই নিজেদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনোভাবকে যেকোনো কিছুর ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছিলেন।

e-ISBN: 978-93-7020-770-7

বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে ১৮৫৫ সালে ১২৭টি আবেদন পত্র কয়েক হাজার মানুষ স্বাক্ষর করেছিলেন। অপরপক্ষে, রাধাকান্ত দেবও এই প্রথা রক্ষা করার জন্য কয়েকটি আবেদনপত্র পাঠিয়েছিলেন। এর ফলস্বরূপ জে.পি.গ্রান্ট বহুবিবাহের রোধে একটি খসড়া বিল তৈরি কারার প্রতিশ্রুতি দেন এবং সেইমত রামাপ্রসাদ রায়ের চেষ্টায় একটি খসড়া বিলও তৈরি হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হওয়ার ফলে ইংরেজ সরকার ভারতবাসীর ধর্মীয় ধ্যান-ধারণায় হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকার ফলে বিদ্যাসাগরের উদ্যোগ ব্যর্থ হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "এই হতভাগ্য দেশের দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সময় রাজবিদ্রোহ উপস্থিত হইল। রাজপুরুষেরা বিদ্রোহ-নিবারণ বিষয়ে সম্পূর্ণ ব্যাপৃত হইলেন, বহুবিবাহ বিষয়ে আর তাঁহাদের মনোযোগ দিবার অবকাশ রহিলনা।"[৯]

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হলে যেকোনো প্রকারের সমাজসংস্কার মূলক আন্দোলন থমকে গেলেও সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তী কালেও সমাজসংস্কার আন্দোলনগুলি নতুন মাত্রা লাভ করে। ১৮৭১ সালের ১০ই আগস্ট বিদ্যাসাগর মহাশয় 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' নামে দুখণ্ডে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে পুনরায় প্রতিবাদে মুখর হন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে, "বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকাতে অশেষ প্রকারে হিন্দু সমাজে অনিষ্টই হইতেছে। সহস্র সহস্র বিবাহিত নারী, যারপরনাই যন্ত্রণাই ভোগ করিতেন, যে উপায়ে হউক, এই প্রথা রহিত হইলেই সমাজের মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল ঘটিবেক তাহার কোনো হেতু বা সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায়না।... আমরা নিজেই সমাজের সংশোধনকার্য সম্পন্ন করিতে পারিতাম, ইচ্ছা নাই, চেষ্টা নাই, ক্ষমতা নাই, সুতরাং সমাজের দোষ সংশোধন করিতে পারিবেন না। কিন্তু তদর্থে রাজদ্বারের আবেদন করলে অপমানবোধ বা সমালোচনা এরূপ লোকের সংখ্যা বোধকরি অধিক নহে এবং অধিক না হইলে দেশের ও সমাজের মঙ্গল।"[১০]

১৮৭৩ সালে বিদ্যাসাগর মহাশয় 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার'-এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করে রাজকুমার ভট্টাচার্য, গঙ্গাধর কবিরাজ প্রমুখ সমালোচকদের যুক্তি খণ্ডন করে লেখেন, "যিনি যতই বিতন্ডা করুন, যিনি যতই ইচ্ছা পান্ডিত্য প্রকাশ করুন, যদৃচ্ছাক্রমে একাধিক বিবাহ করা কোনও মতেই প্রতিপন্ন হইবার নহে। শাস্ত্রের অর্থ না বুঝিয়া অথবা বিপরীত অর্থ বুঝিয়া, কিংবা অভিপ্রেত সিদ্ধির নিমিত্ত স্বেচ্ছানুসারে অর্থান্তর কল্পনা করিয়া, শাস্ত্রের দোহাই দিয়া সদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ কান্ত বৈধ বলিয়া ব্যবস্থা প্রচার করিলে, নিরাপরাধ শাস্ত্রকারদিগকে নরকে নিক্ষিপ্ত করা হয়।"[১১]- বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুবিবাহ প্রথার ভয়ংকরতা তুলে ধরতে যে তথ্য উপস্থাপন করেছিলেন সেখানে দেখা যাচ্ছে, হুগলি জেলাতেই ৮৬টি গ্রামে ১৯৭ জন কুলীন ব্রাহ্মণের মোট স্ত্রীর সংখ্যা ছিল ১২৮৮ জন। আবার অপর এক তথ্য থেকে জানা যায় বরিশাল ও ফরিদপুর জেলার ১১৭ টি গ্রামে ৬৫২ জন কুলীন ব্রাহ্মণদের স্ত্রীর সংখ্যা ছিল ৩৫৮৮ জন। তাঁদের মধ্যে বরিশাল জেলার কলসকাঠী গ্রামের বাসিন্দা ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৫৫ বছর বয়সে ১০৭ টি বিবাহ করেছিলেন। এই সকল পরিসংখ্যান থেকে অনুমান করা যায়, তৎকালীন সমাজে বহুবিবাহ বহু বঙ্গনারীর জীবনে অভিশাপ হয়ে নেমে ছিল, বহুবিবাহের চরম পরিণতি ছিল অসহ্য মানসিক যন্ত্রণা ও বৈধব্য। বিদ্যাসাগর মহাশয় স্পষ্টভাবে অনুভব করতে পেরেছিলেন যে বিধবা বিবাহের মতো একটি নির্দিষ্ট আইন প্রণয়নের মাধ্যমেই বহুবিবাহ প্রথা রদ করা সম্ভব হবে, সেই সময় সমাজে অনেকেই মনে করেছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে সমাজ আধুনিক হলে বহুবিবাহ সমাজ থেকে মুছে যাবে। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় জানতেন সেসময় সমাজ ব্যবস্থা যতই আধুনিক হোক না কেন পুরুষতান্ত্রিক সমাজে ধর্মের বিষয়টি মানবিক দায়িত্ববোধের চেয়ে সর্বদাই বড় থাকবে। তাই বিদ্যাসাগর তাঁর সংস্কারমূলক কর্মসূচিকে যতদূর সম্ভব সরকারি সমর্থনের সীমার মধ্যে রাখতে চেয়েছিলেন। অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্র

e-ISBN: 978-93-7020-770-7

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্যোগকে মান্যতা দেননি। তাঁর মতে- "বহু বিবাহ এদেশে সত্যিই নিবারিত হইয়া আসিতেছে; অল্পদিনে একেবারেই লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। তজ্জন্য বিশেষ আড়ম্বর আবশ্যক বোধ হয় না। সুশিক্ষার ফলে উহা অবশ্য লুপ্ত হইবে।"[১২]- বিদ্যাসাগরের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বহুবিবাহ নিবারণমূলক আইনের পক্ষে সেভাবে জনমত গঠিত না হওয়ার শেষ পর্যন্ত বহুবিবাহ আইন পাস হয়নি। তা সত্ত্বেও বলা যায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রচেষ্টা ছিল এককথায় অনস্বীকার্য। তাঁর বহুবিবাহের বিপক্ষে যুক্তি-তর্ক সমাজের গণ্যমাণ্যদের যুক্তিতর্ককে খণ্ডন করেছিলেন বটে তবে তা প্রাচীন সমাজের বিধিনিষেধের বেড়াজালকে শেষ পর্যন্ত ভেদ করতে পারেনি। তবে তাঁর মানবিক প্রচেষ্টার ফল তাঁর মৃত্যুর পর পাওয়া যায় ১৯৫৫ সালে 'হিন্দু কোড বিল' পাশ করে ভারত সরকার বহুবিবাকে বাতিল বলে ঘোষণা করার পরে।

স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে বিদ্যাসাগরের অবদান

ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন স্ত্রীশিক্ষাই ছিল নারী স্বাধীনতার পথে প্রথম পদক্ষেপ। ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে মিশনারীদের উদ্যোগও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কলকাতার ব্যাপটিস্টমিশনের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং ইউরোপীয় মহিলাদের 'ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি' নামক সংগঠনের উদ্যেগে প্রথম ফিমেল জুভেনাইল স্কুল স্থাপিত হয় উল্টোডাঙ্গার গৌরীবাড়ি অঞ্চলে। এর দু-বছরের মধ্যে আরও তিনটি স্কুল স্থাপিত হয়। ইতিহাসের দিক থেকে এই স্কুল চারটিকে আধুনিক নারীশিক্ষার প্রথম উদ্যোগ বলা হলেও বিভিন্ন কারণে এই স্কুলগুলি হিন্দু সমাজে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। "...মিশনারী স্কুলে ধর্মান্তকরনের আশঙ্কা এবং হিন্দু সমাজের অস্পৃশ্য শ্রেনির মেয়েদের সঙ্গে একসঙ্গে পড়ার সমাজিক বাধা ছিল স্ত্রীশিক্ষার প্রধান প্রতিবন্ধক।"[১৩]- সেসময় দেশের ইংরেজ শাসকেরা ভারতীয় নারীদের শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজন কখনই উপলব্ধি করেননি, তাঁরা মনে করতেন ভারতীয় নারীরা পাশ্চাত্যের আধুনিক শিক্ষার যোগ্য না। বিদ্যাসাগরই প্রথম ইংরেজদের ধারণা নস্যাৎ করে নারীদের আধুনিক শিক্ষা প্রদানের কথা ভেবেছিলেন। তিনি একথাও বুঝেছিলেন যে বই লিখে, বক্তৃতা দিয়ে সাধারণ মানুষের ধর্ম, বিশ্বাস ও কুসংস্কার কোনোদিনই কাটানো সম্ভবপর হবেনা। একমাত্র শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে তা সম্ভব, এই উদ্দেশ্যেই তিনি ছাত্রদের শিক্ষা বিস্তারের সাথে সাথে বাংলার সমগ্র নারী জাতির সার্বিক উন্নতির কথা চিন্তা করেছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন বাংলার অধিকাংশ গৃহবন্দী নারীদের শিক্ষা বিস্তারের প্রধান বাধা ছিল ধর্মীয় কুসংস্কার। কোনো বালিকা প্রকাশ্যে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে বিদ্যালয়ে গিয়ে শিক্ষা অর্জন করবে এমন কথা ভাবাটাই ছিল মহাপাপ। ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকে স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারটি খুবই খারাপ অবস্থায় ছিল।

অ্যাডাম নামে এক সাহেবের রিপোর্ট অনুযায়ী, তিনি তাঁর আমলে বাংলায় তেমন বালিকা বিদ্যালয় দেখেননি। তাঁর মতে অজ্ঞতার অন্ধকারেই ডুবে ছিল এদেশের মহিলারা। ১৮১৩ সালে কোম্পানির সনদেও নারীদের শিক্ষা বিস্তারের জন্য কোনো অর্থ বরাদ্দ ছিলনা। ১৮২১ সাল নাগাদ স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের উদ্দেশ্যে এদেশে এসেছিলেন মিস কুক। তাঁর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় কলকাতায় আটটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। পরবর্তী সময়ে ১৮৪৯ সালে ভাইসরয়ের লেজিসলেটিও কাউন্সিলের সদস্য এবং এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতি জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন, একুশটি বালিকা নিয়ে ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল নামে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাথে বেথুন সাহেবের পরিচয় হয়। বিদ্যাসাগরের পান্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে তিনি তাঁর কর্মযজ্ঞে বিদ্যাসাগরকে সামিল হতে আহ্বান জানান, এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ও এই আহ্বানকে বিনম্রচিত্তে গ্রহণ করেন। এই ভাবে নারী শিক্ষা বিস্তার আন্দোলনে তাঁর যাত্রার শুভারম্ভ ঘটে। বেথুন সাহেব মিশনারীদের স্কুলগুলির অবস্থা দেখে ঘোষণা করেছিলেন যে, "এই

বিদ্যালয়ে কোন ধর্মশিক্ষা দেওয়া হবে না কিংবা হিন্দুধর্ম নিয়েও কোন মন্তব্য করা হবে না। (Not meddling with the religion of your children)।"[১৪]- সেই সঙ্গে তিনি আরও একটি কথা জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, কেবল অভিজাত বাড়ির হিন্দু মেয়েরাই এই বিদ্যালয়ে পড়তে পারবেন। এই ঘোষণায় বিদ্যাসাগর মহাশয় গভীরভাবে মর্মাহত হন। এই জন্য বিদ্যাসাগর স্কুল কমিটির সেক্রেটারি হওয়ার পর তিনি যেসব রিপোর্ট সরকারের কাছে পাঠিয়েছেন তাতে বারংবার সমাজের সকল শ্রেণির নারীদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করার কথা বলেছিলেন। এই সমস্ত কারণে নারীদের সমাজের সকল শ্রেণির নারীদের শিক্ষাপ্রদানের উদ্দেশ্যে ১৮৫৭-৫৮ সালের মধ্যে বিদ্যাসাগর বাংলার ৮ জেলাতে ৪০টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন, সেগুলিতে মোট ১৩৭০ জন ছাত্রী পড়ত। এই স্কুলগুলি স্থাপিত হয়েছিল মফঃস্বল শহরেও নয়- একেবারে গ্রামে। এই স্কুলগুলি যে যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল তা স্কুলের পাঠরত ছাত্রীদের সংখ্যা দেখেই অনুমান করা যায়। বেথুন স্কুলের সমস্যা গুলি গ্রামের এই স্কুলগুলিকে পীড়িত করেনি। গ্রামে পারস্পারিক মেলামেশার একটি আবহ থাকার জন্য জাত-অস্পৃশ্যতা ইত্যাদি প্রশ্নে একটি সর্বজনস্বীকৃত ব্যবস্থা গ্রাম্য সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। নারীর স্বাধীনতার প্রশ্নে গ্রাম্য সমাজ ছিল অনেকটাই অগ্রগামী। তাঁর স্থাপিত ৪০টি বালিকা বিদ্যালয়ের মধ্যে ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় সরকারি অনুমোদন পায়নি। তিনি এগুলি নিজ ব্যয়ে চালাতেন। নারীশিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি 'নারী শিক্ষা ভাণ্ডার' নামে তহবিল গঠন করে এগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমালোচকরা বলেন যে, নারীশিক্ষার প্রতি সহানুভূতিশীল হলেও তিনি তাঁর স্ত্রী-কন্যাদের শিক্ষার প্রতি অবহেলা করেছিলেন, এসব সমালোচনা সত্ত্বেও বলা যায়, তিনি সার্বিকভাবে নিজের বোধবুদ্ধি এবং দূরদর্শিতার কারণে এদেশে নারীশিক্ষা প্রসারের অগ্রদূত হয়ে উঠেছিলেন। তিনি নিজের মৃত্যু পর্যন্ত নারীশিক্ষা বিস্তারের কাজে সহায়তা করেছিলেন, কারণ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে নারীদের শিক্ষাদানের মাধ্যেমেই পরাধীন ভারতবর্ষ নতুনভাবে জেগে উঠবে। তাঁর স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের উদ্যেগে নতুন পালক যুক্ত হয়েছিল যখন ১৮৭৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মেয়েদের উচ্চশিক্ষিত হওয়ার ছাড়পত্র হিসাবে পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি দিয়েছিল এবং ঐ বছরই বেথুন স্কুল থেকে কাদম্বিনী বসু এই এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করেন। "১৮৮৪ সালে চন্দ্রমুখী বসু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালা থেকে এম.এ. পরীক্ষায় পাশ করলে তিনি উপহার স্বরূপ সেক্সপীয়রের একখন্ড রচনাবলী পাঠিয়ে যে চিটি লিখেছিলেন তাতে আশা প্রকাশ করেছিলেন, "সজ্জন সমাজে প্রতিষ্ঠাভাজন হও"।"[১৫]- সমকালীন বিভিন্ন ঘটনাবলী থেকে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন শিক্ষাই অন্ধকারকে দূরে ঠেলে দিয়ে নারী জীবনে আলো নিয়ে আসতে পারে। এই আলোর দ্বারাই নারীজাতির এক নতুন দিগন্তের সন্ধান পাবে, তাই তিনি তাঁর সমগ্র জীবন স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে নিয়োজিত করেছিলেন।

উপসংহার

ঊনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দু সমাজের সার্বিক সংস্কার বিশেষত নারীমুক্তি আন্দোলনে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান ছিল অতুলনীয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছিলেন যে, শুধুমাত্র সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ বা বিধবা বিবাহ প্রচলনের মতো দু-একটি পদক্ষেপের দ্বারাই নারীমুক্তি ঘটবে না। মেয়েদের আত্মমর্যাদার সাথে সমাজে সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত করা এবং নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সঠিক ভাবে সচেতন হওয়ার জন্য প্রয়োজন হল শিক্ষার। তিনি তাই উপলব্ধি করেছিলেন যতদিন না মেয়েদের শিক্ষার আঙিনায় প্রবেশ করানো যাবে ততদিন পর্যন্ত সমাজে উন্নতি ঘটানো সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে উনিশ শতকের মানবতার প্রথম গুরুপ্তপূর্ণ দিকচিহ্ন ছিল নারীমুক্তি। এই নারীমুক্তি আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, শিক্ষা বিস্তারকেই নারীর শৃঙ্খলমোচনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি বলে স্বীকার কারা হচ্ছে। তাই নিরক্ষরতা দূর করতে না পারলে নারীকল্যাণ সম্ভব নয় একথা সহজেই বলা যায়।

e-ISBN: 978-93-7020-770-7

আদর্শ নারী-জীবন বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন হল নারীশিক্ষা, যা নারী শক্তিকে জাগ্রত করার প্রথম সোপান। এই মানবতার আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই বিদ্যাসাগর মহাশয় নারীমুক্তিকে তাঁর জীবনের অন্যতম মহান ব্রত রূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রয়াসের ফলেই ভারতবর্ষের বহু নারী বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথার হাত থেকে নিস্তার পেয়েছিলেন তথা বিধবা বিবাহ আইন প্রবর্তন ও শিক্ষার প্রসারের ফলে বহু নারী সমাজে আত্মমর্যাদার জীবন উপভোগ করতে পেরেছিলেন। তাই পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন ভারতবর্ষের নারীমুক্তি আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা।

তথ্যসূত্র

১. মজুমদার, মৌসম, মানবরত্ন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, (২০১১), তপতী পাবলিকেশন, কোলকাতা, পৃ. ৫৭
2. ঐ, পৃ. ৫৭
৩. ঐ, পৃ. ৫৮
8. বসু, দেবকুমার, বিদ্যাসাগর রচনাবলী (সম্পাদিত),(১৯৬৬), দ্বিতীয় খন্ড, মন্ডল বুক হাউস, কলিকাতা, পৃ. ১১৫-১১৬
৫. মজুমদার, মৌসম, মানবরত্ন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, (২০১১), তপতী পাবলিকেশন, কোলকাতা, পৃ.৪৮
৬. Basu Monmayre, Hindu Women and Marriage Liars, (2001), Oxford, P. 46-47
৭. মজুমদার, মৌসম, মানবরত্ন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, (২০১১), তপতী পাবলিকেশন, কোলকাতা, পৃ.৪৮
৮. Proceeding of the Legislative Council of India, 1891, PP. 16-91. Note on the Bill to amend the Indian Penal Code and Code of Criminal Procedure, 1882 by Pandit Iswar Chunder Vidyasagar. WRP, National Archives.
৯. বসু, দেবকুমার, বিদ্যাসাগর রচনাবলী (সম্পাদিত), (১৯৬৬), চতুর্থ খন্ড, মন্ডল বুক হাউস, কলিকাতা, পৃ. ৩
১০. মজুমদার, মৌসম, মানবরত্ন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, (২০১১), তপতী পাবলিকেশন, কোলকাতা, পৃ.মনুমদার পৃ. ৪৬-৪৭
১১. ঐ, পৃ.৪৭
১২. ঐ, পৃ. ৪৭
১৩. সামন্ত, অমিয় কুমার, বিদ্যাসাগর (২০০৪), প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স; কলকাতা, পৃ. ৭০
১৪. ঐ, পৃ. ৭0
১৫. ঐ, পৃ.৭৫